অস্থির চালের বাজার, উপেক্ষিত অর্থশাস্ত্র

২০০৮-০১-১৭ : ড. এ. কে. এনামুল হক

দেশের চালের বাজারের অস্থিরতা বিষয়ে নতুন কিছু বলা খুবই মুশকিল। কারণ সমস্যাটা আমরা সবাই বুঝি। চালের দাম গত এক মাসের মধ্যে বেড়েছে ৩০ শতাংশেরও বেশি। নভেম্বর মাসে নবান্নের পর চালের দামের এই অবস্থা কারো কাম্য নয়। বাজারের এই অস্থিরতা সরকারকে করেছে বিব্রত। শুধু সরকারকে নয়, সরকারের সহায়ক সবাই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, এর পেছনেও নিশ্চয় রাজনীতি রয়েছে। এই ধরনের মন্তব্য বা আলোচনা যখন সরকারের নীতিনির্ধারক মহল কিংবা ওই রকম শক্তিশালী কেউ করে ফেলেন তখন বাজার নিজেও বোধকরি কিছুটা বিব্রত হয়, লাজুক হয়। এর ফলে যা ঘটবার নয় তাই ঘটে যায় সবার অজান্তে। অস্থিরতা আরো বাড়ে। দিকভ্রান্ত কিংবা উন্মাদের মতো আচরণের বহিঃপ্রকাশ হয়। ফলাফল আরো খারাপ হয়। বাজারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

দুঃখজনক হলো, অর্থনীতির নীতি নিয়ম কেউ মানতে চান না, বুঝতে চান না। পরিস্থিতি ক্রমাগত ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন, আমিই পারি সব করতে। এত লোক আমার কথায় উঠে বসে, এত লোক আমাকে তোষামোদি করে আর সামান্য কয়টি চালের ব্যাপারির কাছে আমরা হার মানব? হতে পারে না, হবে না। এই যখন অবস্থা তখনই আমি ঠিক করলাম বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা সবাইকে বলি। উদ্দেশ্য চালের দাম কমানো নয়। তবে কী কী করলে চালের দাম কমবে না সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা। পাঠক, এই লেখাটি অর্থনীতির প্রথম পাঠ হিসেবে নেবেন। যেহেতু বিষয়টি বেশ জটিল তাই আমার লেখা পড়েই যদি মনে করেন, আহা সমস্যার সমাধান আমিই করতে পারি তবে এটুকু বলব, এত সহজ হলে পরিশ্রম করে অর্থনীতি পড়ার কোনো দরকার আমাদের নেই।

প্রথমত বলি মজুতদারি বিষয়ক জটিলতা নিয়ে। মজুতদার তাকেই বলে যিনি পণ্যের দাম বাড়ানোর লক্ষ্যে সাময়িকভাবে পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। বাজারে পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পেলে দাম বাড়বে তা বলা বাহুল্য। এটা জানা যেমন সোজা তেমনি এই ধরনের অবস্থা বিরাজ করার অর্থনীতির পূর্বশর্ত হলো, বাজারের সরবরাহ বাড়ার দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ বাজারে সরবরাহ কমে গেলে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য অপর কেউ সরবরাহ বাড়াবে না। এই পরিস্থিতি তৈরি করার ক্ষমতা কারো রয়েছে তা বলা যতটা সহজ করা ততটা সহজ নয়। কারণ দেশের অন্য ব্যবসায়ীরা নিশ্চয় ঘাস খায় না। এক ব্যবসায়ী মজুত করলে অন্যরাও করবে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দাম বাড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। অথচ তা না বুঝে যদি সরকার কোনো কোনো মজুতদারের বিরুদ্ধে কথা বলে তবেই ঘটবে বিপত্তি।

মনে হতে পারে, কৃষকরা মজুত করে না। মজুত করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে যে সব মিল মালিক তারা কিংবা দেশের চালের আমদানিকারকরা। একটু ভেবে দেখুন শত শত চাল বিক্রেতা, মিল মালিক কিংবা আমদানিকারক একত্র হয়ে চালের দাম বাড়াতে পারবে কি? এত ব্যবসায়ীকে এক করা যাবে? তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে এই বিষয়ে একটি তত্ত্ব রয়েছে যার সাহায্যে বলা যায়, চালের বাজারে এই অবস্থা বাস্তবতাবিবর্জিত চিন্তা। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে একটু স্পষ্ট করি। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে ১১ কোটি ৭০ লাখ ডলার মূল্যের চাল। ২০০৭ সালে আমদানি হয়েছে ১৮ কোটি মূল্য ডলার মূল্যের চাল। এত বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি কি কয়েকজন ব্যবসায়ী করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন? নিশ্চয়ই নয়। অথবা আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, দেশের জন্য ১৮ কোটি ডলারের চাল আমদানির অর্ডার কোনো একটি বিশেষ ব্যাংকের একার পক্ষে দেয়া সম্ভব? দেশে এমন বহু পণ্য রয়েছে যেখানে মোট আমদানিকারকের সংখ্যা ১০-২০ জন লোক অথচ সেখানে সরবরাহ কমিয়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে না। বরং উল্টোভাবে বলা চলে, মজুতদার না থাকলে সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাই দেখবেন, বাজারে চালের সংকট দেখা গেলেও টিভির সংকট দেখা যায় না। এর কারণ আমরা চালের মজুত নিয়ে বেশি কথা বলি, টিভির মজুত নিয়ে চিন্তাও করি না।

দ্বিতীয়ত, মজুতদারি শব্দটি বাংলাভাষায় যেভাবে ব্যবহৃত হয় ইংরেজিতে ঠিক সেই অর্থে কখনই ব্যবহার করা হয় না। ইংরেজিতে আমরা বলি ইনভেন্টরি। এই ইনভেন্টরিই কিন্তু বাজার ব্যবস্থার চালিকাশক্তি। তাই দেখবেন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়িয়ে থাকি। পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি না থাকলেই বরং বাজারে সংকট আসন্ন হয়। ব্যবসায়ীরা উৎপাদন মৌসুমে যদি পর্যাপ্ত মজুত না করে তবে চালের বাজার হবে অস্থিতিশীল—অন্তত অর্থনীতির বিশ্লেষণ তাই বলে। কোনো ব্যবসায়ী যদি প্রয়োজনের বেশি সংগ্রহ করে তবে বিক্রির সময় দাম বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেই পরিমাণ মজুতই সাধারণত রাখে যার মাধ্যমে তারা অধিক মুনাফা করতে পারে। দক্ষ বাজার ব্যবস্থায় তাই দামের উৎপাদন মৌসুমের চেয়ে অন্য সময়ে চালের দামে ব্যবধান খুব বেশি হয় না। তাই বলা যায়, স্টক বা মজুত বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি সহায়ক শক্তি। আমাদের দেশে অনেকেই এই অতি সাধারণ নিয়মকে বুঝে উঠতে পারছেন না। বলছেন মজুতের সংজ্ঞা দিয়ে স্টক নিয়ন্ত্রণ করতে।

যদি বাজারে বিক্রেতাদের কাছে পর্যাপ্ত মজুত না থাকে (উৎপাদন ঘাটতি, মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ আইন বা পর্যাপ্ত আমদানির এলসি খোলা না হলে) তখন আগামী দিনে বাজারে সরবরাহ সংকট হবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত সহজ—বিক্রেতা ব্যবসায়ী যদি বুঝতে পারে যে, সরকারের হাতেও পর্যাপ্ত মজুত নেই তাহলে আগামীতে দাম বাড়বেই। এ জন্যই অনেক ক্ষেত্রে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত আপদকালীন মজুত রাখতে উপদেশ দেয়া হয়। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি প্রধান উপায় (ভিন্ন অর্থে সরকারিভাবে মজুতদারি করা!)। আমাদের নীতিনির্ধারক মহল এই সহজ বিষয়টি আমলে আনেননি। বাজারে চালের দাম বাড়লে সরকারের উচিত তা ক্রাইসিস পর্যায়ে যাওয়ার আগে খোলাবাজারে চাল ছেড়ে দেয়া। এটিই হলো ওএমএস ব্যবস্থা। প্রশ্ন হতে পারে, কেন সরকার এত দেরি করল? উত্তরও বেশ সহজ—সরকারের হাতে পর্যাপ্ত মজুত নেই। বুঝতে হবে হাতে মজুত থাকা

আর বন্দরের জাহাজে মজুত খালাস করার মধ্যে ন্যূনতম ১৫ দিনের ফারাক। আর তা যদি সরকারি ক্রয় কমিটির কাছে থাকে (অর্থাৎ ক্রয় কমিটি ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে) তবে বাজারে তার প্রভাব আসবে ন্যূনতম ৪০ দিন পর। কাজেই বুঝতেই পারছেন, কাদের কারসাজি বা বোকামির কারণে চালের বাজার অস্থিতিশীল হয়েছে। বন্যা, সাইক্লোন কিংবা বিশ্ববাজারে চালের দাম বা ডলারের ছন্দপতন সবই সত্য তবুও চালের দাম এতটা বাড়ার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব ব্যাখ্যা বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখানোর গল্পের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বিগত দশকে বিশ্বব্যাংক আমাদের দেশের নানান নীতি নির্ধারণ করেছে। কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে তারা দেশ শাসনও করছে। তারাই পরামর্শ দিয়েছিল দেশের চালের আপদকালীন মজুতের পরিমাণ বাড়ানো ঠিক হবে না। দেশে কোনো সাইলো নির্মাণে তারা সরকারকে সাহায্য করেনি। উল্টো শর্তারোপ করে দেশে সরকারি বহু প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি দেশের সরকারি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে। ফলে দেশে নতুন ব্যবসায়ী তৈরি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম সীমিত করে দেয়ায় সাধারণ মানুষ নয়, কেবল রাজনীতিতে সংযুক্ত ব্যবসায়ীরাই সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিতে পেরেছেন। ব্যবসা-কাম-রাজনীতি নতুন ব্যবসায় রূপান্তর হয়েছিল। এই অঘটনের দায় কি বিশ্বব্যাংকের ওপর বর্তায় না? উপরন্তু ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলো গুটিকয়েক পরিবারের হাতে থাকার ফলে দেখা যাচ্ছে এখানেও নতুন ব্যবসায়ী তৈরির রাস্তা সীমিত হয়ে পড়েছে। একটু ভেবে দেখুন ব্যবসায়ী মহল বিগত দশ বছর যাবৎই বলে এসেছে, 'ব্যবসার অবস্থা ভালো না'। অথচ ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলো ওইসব ব্যবসায়ীকে ঋণ দিয়েই কোটি কোটি টাকা লাভ করেছে। স্পষ্টভাবে কেউ এখানে সত্যের অপলাপ করছেন আরো সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই নতুন ব্যবসায়ী সৃষ্টি করার আগে ব্যবসায়ীদের শ্বাসমূলে আঘাত দেয়াটা সরকারের জন্য হয়েছে অত্যন্ত বোকামি। গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের অর্থনীতির একটি চক্র জড়িত বলে আমার বিশ্বাস। সরকারের উচিত বিশেষ অর্থনৈতিক টাস্কফোর্স তৈরি করে অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির ব্যবস্থা চিহ্নিত করা।

তৃতীয়ত, দেখা যাক নবান্নের আগে চাল আমদানির অবস্থা কী ছিল? চাল আমদানির হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৬ সালের জুলাই-অক্টোবর সময়ে চাল ও গম আমদানির জন্য ৫৬ কোটি ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল, ২০০৭ সালের এই সময় তা ছিল ১১৬ কোটি ডলার। অর্থাৎ দেশে খাদ্য আমদানির পরিমাণ (দাম সেই অনুপাতে না বেড়ে থাকলে) বেড়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমদানির এলসির পরিমাণ কমেনি। এ ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন চাল বাজারে এলে দাম কিছুটা কমার কথা। কিন্তু এই বছর বন্যায় ফসলহানি হয়েছে। তাই চালের দাম আগামীতে কিছুটা বাড়বে ভেবে একটু বেশি স্টক করতে পারেন। করাটা অস্বাভাবিক নয়। তাদের বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার উপায় হলো সরকারের আপদকালীন মজুতের পরিমাণ বাড়ানো। বুঝতেই পারছেন অর্থশাস্ত্র বলছে না যে ব্যবসায়ীদের ধমক দিয়ে দাম কমাতে হবে। তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে চৈত্র বা মাঘ মাসে দেশে চালের আকাল হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। আবার যদি দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা নভেম্বর মাসে কোনো কারণে বাজারে পর্যাপ্ত চাল কিনতে না পারেন তবে আকাল এখনই শুরু হবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের হাতে মজুতের পরিমাণ যত কম হবে আগামী মাসগুলোতে চালের দাম ততই বাড়বে। তাহলে বিষয়টি দাঁড়ালো, মজুত কম থাকার অর্থই হলো আগামী দিনে সরবরাহ করার ক্ষমতা কম তাই দাম বেড়ে যাবে। মজুত কমানো কিন্তু অত্যন্ত সহজ। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে অর্থনীতির সাধারণ ব্যাখ্যা হলো মজুত বাড়ানোর ব্যবস্থা করা, কমানো নয়। এমতাবস্থায় মজুতদারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া মানেই হলো তারা মজুত কমিয়ে দেবে এবং সেই ক্ষেত্রে আজকে হয়তো দাম একটু কমবে তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দাম আবারো বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থত, ব্যবসায়ীদের অত্যধিক মুনাফা করার লালসাকে অনেকেই দায়ী করেন পণ্যের উচ্চ মূল্যের জন্য। এই অভিযোগটি ধোপে টেকে না। মনে করুন আপনার কাছে ১০০০ টাকা আছে। মনে করুন চালের ব্যবসায় আপনাকে ১০% হারে মুনাফা বেঁধে দেয়া হলো। এক্ষেত্রে আপনি এই টাকায় সর্বোচ্চ ১০০ টাকা মুনাফা করতে পারবেন। অথচ মনে করুন আপনি চালের বদলে পেঁয়াজের ব্যবসা কিংবা দুধের ব্যবসা বা কাপড়ের ব্যবসা করতে পারতেন। সেক্ষেত্রেও কি মুনাফা বেঁধে দেয়া হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। তাই যদি মুনাফার হার বেঁধে দেয়া হয় [সরকারিভাবে], আপনার টাকা থাকলে আপনি যত শিগগির সম্ভব চালের ব্যবসা ছেড়ে অন্যকিছুর ব্যবসা শুরু করবেন। এর ফলে দেশে চালের বাজার স্থিতিশীল হবে না অস্থিতিশীল হবে? অধিক মুনাফাকে অনৈতিক মনে করার কোনো কারণ নেই। মুনাফার হার অধিক থাকার অর্থ বাজারে পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়নি। তাই মুনাফার হার কমাতে হলে সৃষ্টি করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পঞ্চমত, অনেকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, চালের ব্যবসায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে তাই দাম বেড়ে যাচ্ছে। ধারণাটা অত্যন্ত অমূলক। মধ্যস্বত্বভোগীরা বড় ব্যবসায়ী নয়। তাদের সংখ্যা অনেক। তারা পালা করে দাম বাড়াতে পারে না। চাষীরা যে মূল্য পায় আর ক্রেতারা যে মূল্য দেয় তার মধ্যে যারা কাজ করে তাদের কাজকেও অর্থশাস্ত্রে উৎপাদনশীল কাজ বলা হয়। যখন আমার পাশের বাড়ির কৃষক আমার কাছে চাল বিক্রি করে তখন এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দেখা যায় না। যখন কৃষক ও ক্রেতার মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকে, স্থানে পার্থক্য থাকে, কিংবা প্রক্রিয়াজাত করার বিষয় থাকে তখন মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রয়োজন হয়। তারা না থাকলে বাজার ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আড়ত কিংবা গ্রামীণ এরাও এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী। তাদের কাজ অনৈতিক নয়, অগ্রহণীয় নয় কিংবা তারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়ও নয়। তবে তারা সেই সব বাজারেই বেশি লাভ করে যেখানে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে নানা কারণে দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তাই পৃথিবীর বহু দেশে সৃষ্টি হয়েছে কৃষকের বাজার। যেহেতু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রসেসিং করার প্রয়োজনীয়তা কম তাই কৃষকরা যেন সরাসরি বাজারে এসে পণ্য বেচতে পারে তার জন্যই এসব বাজার তৈরি করা হয়। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী এই বাজারে ঢুকতে পারে না। আমরা তা না করে মধ্যস্বত্বভোগীদের দোষারোপ করছি। বাজারে দুই দলই থাকবে এবং একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

অন্যভাবে বলা যায়, মধ্যস্বত্বভোগীদের কাজ হলো পণ্য কৃষকের হাত থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়া। যদি মধ্যস্বত্বভোগী না থাকে তবে কৃষককে তার পণ্য বাজারে আনতে হবে প্রতিদিন। যে কৃষক কৃষিকাজে পারদর্শী সেই কৃষক কি তার পণ্য নিয়ে প্রতিদিন ঢাকায় আসতে পারবে? কিংবা এলে তার যাতায়াত খরচ ব্যবসায়ীদের চেয়ে কি কম হবে বলে আপনি মনে করেন? তবুও কৃষকদের বাজারে সরাসরি ঢোকার অধিকার তৈরি করলে মধ্যস্বত্বভোগীরা হুশিয়ার থাকে।

ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন চালের দাম চড়া। তাই অনেকেই সার্বিক ব্যর্থতার দায় আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর দিয়ে নিজের দায়বদ্ধতা এড়াতে চান। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে থাইল্যান্ডের মোটা চাল আন্তর্জাতিক বাজার বিক্রি হচ্ছে প্রতি টন ৩১৫ ডলার হারে। অর্থাৎ মোটা চালের কেজি ২১-২২ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজার মার্চে চাল পাওয়ার জন্য আপনি যদি এখন অগ্রিম চাল কিনতে পারেন, সেই বাজারে মার্চে সরবরাহ করবে এমন মোটা চাল এখন পাওয়া যাচ্ছে ৩৫০ ডলার হারে (টনপ্রতি)। যার কেজিতে মূল্য হলো ২৩-২৪ টাকা। শিকাগোর পণ্য বাজারে জানুয়ারি ২০০৬ সালে যে চালের মূল্য ছিল টন প্রতি ১৮০ ডলার ২০০৭ সালে তা হয়েছে ২২৭ ডলার আর ২০০৮ সালে তা বিক্রি হচ্ছে ৩০৪ ডলারে। অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তন ৩৪ শতাংশ। বুঝতেই পারছেন চালের আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়া আর ঢাকার বাজারের চালের দাম বাড়ার সঙ্গে এর একটি গুণগত পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার বাজারে চালের দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ হারে। মোদ্দা কথা, আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে নিজ দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে তুলে দেয়ার অবকাশ নেই।

সপ্তমত, বিশ্বব্যাপী চাল, গম কিংবা ভুট্টার দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ার জন্য কিছুটা দায়ী বিশ্বের তেলের মূল্য। পেট্রোল, ডিজেল কিংবা এই জাতীয় খনিজ জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। বিশ্বের উষ্ণায়ন হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, বাড়ছে সমুদ্রের উচ্চতা, আসছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ থেকে বাঁচার সহজ উপায় পাওয়া যাচ্ছিল না কিন্তু বাজারে তেলের দাম বাড়ার ফলে শস্যভিত্তিক জ্বালানির গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। পেট্রোলের বদলে ইথানল বা বায়োডিজেল ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক দেশেই। ফলে খাদ্য শস্যের চাহিদা বেড়েছে তেল তৈরির জন্য। বিশ্বব্যাপী কৃষি জমির পরিমাণ কমছে। আমাদের দেশেও তা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কমে গেছে। তাই আগামীতে কৃষি পণ্যের দাম বাড়বে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকের অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হবে। কিন্তু যারা সারা বছর চাল কিনে খান তাদের জন্য তা হবে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। তাই সরকারকে ভাবতে হবে কী করে কৃষকের আয় বাড়িয়ে কৃষি পণ্যের দাম কমানো যায়। প্রয়োজন হবে পৃথিবীর সব উন্নত দেশের মতো প্রকৃত কৃষককে কী করে ভর্তুকি দেয়া যায় তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করা। প্রয়োজন হবে নগরবাসী জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে তা গ্রামে পৌঁছে দেবার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা। নাগরিককেও বুঝতে হবে ভিক্ষুক কখনো ভিক্ষা দেয় না। তাই সুনাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব হলো কর দেয়ার সামাজিক নিয়ম তৈরি করা, নিয়মিত কর দেয়া। কর বিভাগতে হতে হবে সৎ, দক্ষ ও নিয়মানুবর্তী। নাগরিক যদি কর না দেয় তবে সরকারকে হতে হবে পরমুখাপেক্ষী। ভিক্ষুক সেজে বিশ্বব্যাংক বা ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা এনে দেশের জনগণের উপকার করা যায় না এই সত্যটুকু সবাইকে অনুধাবন করতে হবে।

সবশেষে, চালের অস্থির বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে বুদ্ধিমান হতে হবে। বুঝতে হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির ফলে বাজারের আয়তন বাড়ছে। তাই উৎপাদন বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো আর চালের উৎপাদন বাড়ানো কিন্তু একই বিষয় নয়। তাই চাল উৎপাদনকারীদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। আমার এক কানাডীয় কৃষক বন্ধু তার জমিতে গম কিংবা সয়াবিন চাষ করতে পারে। সয়াবিন লাভজনক পণ্য কিন্তু গম দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্য। তাই কানাডা সরকার তাকে প্রতিবছর কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি শর্ত দিয়ে থাকে। তা হলো, সে যদি তার জমির একটি নির্ধারিত অংশে গম চাষ করে তবে সে বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাবে। ফলে সে সবসময় চেষ্টা করে ওই পরিমাণ জমিতে গম চাষ করতে। বুঝতেই পারছেন, কৃষককে রীতিমত তোষামোদি করেই উন্নত বিশ্ব অর্থনীতির কাটা সচল রাখে। জোর-জবরদস্তি কিংবা ধমক দিয়ে নয়।

গত এক বছরে সরকার নিশ্চয় বুঝতে পারছে, কৃষকের চেয়ে নিজে বাঁচতে চাইলেও কৃষি পণ্যের দাম কমাতে হবে। তা কি ধমক দিয়ে সম্ভব হবে? এখন পর্যন্ত আমাদের ব্যাংকগুলো সরকারের দেয়া কৃষি ঋণের ৬০ শতাংশের কম বিলি করতে পেরেছে। ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদেরও অনেকে কৃষকই নয়। গত এক বছরে সারের দাম যেমন বেড়েছে তেমনি সারের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে কেউই আশ্বস্ত হতে পারছে না। কৃষি উৎপাদন যদি না বাড়ে তবে দায়-দায়িত্ব কার হওয়া উচিত? কৃষকের, নাকি চাল ব্যবসায়ীর, নাকি আমদানিকারকের, নাকি সরকারের? বিষয়টি ভেবে দেখতে সবাইকে অনুরোধ করব।

লেখক : ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের সদস্য এবং অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

(সমাপ্ত)